বিস্মৃতির দর্পণে

বিশ্বরূপ

দেবশ্রী চক্রবর্তী

বিস্মৃতির দর্পণে বিশ্বরূপ

বিস্মৃতির দর্পণে বিশ্বরূপ (BISMRITIR DARPANE BISWARUP)

দেবশ্রী চক্রবর্তী (DEBASREE CHAKRABORTI)

প্রথম প্রকাশ: ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও ধরণের প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্যসঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত অমান্য করলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কচি পাতা প্রকাশন কর্তৃক জয় কাপিশ, নিউ মার্কেট, পানাগড় বাজার, পশ্চিম বর্ধমান - ৭১৩১৪৮ থেকে মুদ্রিত ও রেবা দাস কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রচ্ছদপট: কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

সম্পাদক: দীপাঞ্জন দাস

অক্ষর বিন্যাস:

আই.এস.বি.এন: 9788194690603

মূল্য: ৩৯৯/-

ওয়েবসাইট: www.kochipata.org

যোগাযোগ: ৮৬৩৭৮৪৬৪২৪

উৎসর্গ

আমি এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করলাম শ্রীল শঙ্করারণ্য পুরীর
পদকমলে

কথামুখ

নদীয়ার প্রকৃতি এবং এখানকার আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সাথে আজন্ম আমার গভীর সম্পর্ক। এর সবুজ ক্ষেত, নদী, খাল, বিল, ছোট বড়ো জনপদ সব কিছুর আনাচে-কানাচে এক অদৃশ্য আধ্যাত্মিক স্রোত বহমান। কয়েকটি শব্দের বন্ধনে এই গভীর স্রোতকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কয়েকশ বছরের প্রাচীন এই স্রোতের ধারা নদীয়ার বুক থেকে জন্মগ্রহণ করে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে গোটা ভারতভূমিতে বিস্তার লাভ করেছিল। এই স্রোতকে আমি একমাত্র পবিত্র নদী সরস্বতীর সাথে তুলনা করতে পারি। যে সরস্বতীর পবিত্র জলধারা এবং প্রকৃতি বেদের মতো পবিত্র গ্রন্থ রচনার আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা দান করেছিল, আজ সে নিজের মূলস্রোত হারিয়ে মাটির গভীরে প্রবাহিতা।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে নদীয়ার বুকের এই স্রোতকে যাঁরা সারা ভারতভূমিতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেইসব কাণ্ডারীরা ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। পবিত্র ভারতভূমির বুকে যুগে যুগে এরকম সাধকদের আগমন হয়, যারা নিজেদের কর্ম সম্পন্ন করে অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেন। এরকমই একজন উপেক্ষিত রাজনৈতিক সন্ন্যাসী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ।

আমরা সবাই নদের নিমাইয়ের সম্পর্কে জানি। তাঁর অন্তর্ধান নিয়েও বর্তমানে অনেকে গবেষণা করছেন। কিন্তু নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ, যাঁর পদাঙ্ক পরবর্তী সময়ে নিমাই অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সেই অর্থে কোনও গবেষণাই হয়নি। কিন্তু এই বিশ্বরূপকে আমাদের নদীয়ার রত্ন বললেও কম বলা হবে। আমাদের নদীয়ার মাটিতে এইরকম একজন মহান সাধক তথা পণ্ডিত আর দ্বিতীয় জন্মাননি। নিমাইয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে কিছু বইতে বিশ্বরূপের উল্লেখ এলেও, সেটা খুবই অল্প, এই দু'একটি লাইনের মাধ্যমে বিশ্বরূপের মতো মহামানবকে বর্ণনা করা সম্ভব না।

আমি তখন অনেক ছোট, নয় কি দশ বছর বয়স হবে। সেই সময় আমার মামার ছেলের জন্ম হলে আমার দিদিমা তার নাম রাখলেন বিশ্বরূপ। আমি কৌতূহলবশত দিদিমাকে প্রশ্ন করলাম, "দিদিমা এই নামের অর্থ কি শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ?"

দিদিমা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, "না গো না, খুকু, এই বিশ্বরূপ হচ্ছেন নিমাইয়ের অগ্রজ।"

আমার প্রশ্নের শেষ ছিল না। আমিও প্রশ্ন করেছিলাম, "কে এই বিশ্বরূপ

দিদিমা?"

দিদিমা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরমুখে বলেছিলেন, "এরকম মহান পণ্ডিত মানুষের জন্ম আর এই ভূমিতে দ্বিতীয় হয়নি। তাঁর অন্তর্ধানের পর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

সেদিন দিদিমার কথাগুলো আমার শিশুমনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। মাঝে বহু বছর কেটে গেছে, পরবর্তী সময়ে শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এই বিশ্বরূপের প্রসঙ্গ আবার আসে। তখন আমার শৈশবের স্মৃতি আবার ফিরে আসে এবং আমি বিশ্বরূপকে নিয়ে গবেষণা করার গভীর তাগিদ অনুভব করি।

আমার উপন্যাসের নায়ক বর্তমানের বিশ্বরূপের দৃষ্টি দিয়ে আমি অতীতের বিশ্বরূপকে খোঁজার চেষ্টা করেছি। বর্তমানের বিশ্বরূপের এই দীর্ঘ যাত্রায় বহু মানুষের আগমন হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকে এক একজন গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর আত্মিক অনুভূতিকে জাগ্রত করেছেন। এই উপন্যাসের মাধ্যেমে অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গোপন আধ্যাত্মিক সাধনার কিছু ক্ষেত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আজও এই গোপনসাধনা চোরাস্রোতের মতো বয়ে চলেছে।

প্রত্যেক মানুষই কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরাধামে আগমন করেন। বিশ্বরূপ তথা শঙ্করারণ্য পুরী কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরাধামে আগমন করেছিলেন, গৃহত্যাগের পর তিনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, কী কী কাজ করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবু এতো বছর পর সঠিকভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা থাকলেও সবটুকু সত্য উদঘাটন সম্ভব নয়। তবু বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করে, একটি সামগ্রিক সিদ্ধান্তে এসে আমি এই উপন্যাসটি লিখেছি। তবে উপন্যাস তো কল্পনা ছাড়া রচনা সম্ভব না। তাই কল্পনার প্রভার এর ওপরও পড়েছে।

কিছু কিছু বিশেষ দিক, যেমন, নবদ্বীপের বুকে যে কান্তা প্রেমের জন্ম হয়েছিল, সেই কান্তা প্রেমের অন্তর্নিহিত দর্শন তথা রামানুজ, মাধবাচার্য তথা আলোয়ার সম্প্রদায়ের দর্শনকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনার চেষ্টা করেছি। সেই সাথে বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান এবং তার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি।

আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করে এই উপন্যাসটি আমার পাঠকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। এর সাহিত্যগুণ এবং অন্যান্য গুণগত মান বিচারের দায়িত্ব আমি ওঁদের হাতেই তুলে দিলাম।

নমস্কার ও ধন্যবাদসহ,
দেবশ্রী চক্রবর্তী

বিস্মৃতির দর্পণে বিশ্বরূপ
নির্বাচিত অংশ

পর্ব ১৭

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে। বাইরের দৃশ্যপট অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। জীবনের অর্থও তো তাই। অতি দ্রুত তা পরিবর্তিত হয়ে চলে। মানুষের চিন্তাধারা, অনুভূতি সব কিছুই তো এরকম ভাবেই পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সব কিছু কি মানুষের হাতে থাকে? না, তা থাকে না, আনামের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা, যাকে আগলে সে এই পথে এসেছিল। কিন্তু দূরত্ব আনামকে বদলে দিয়েছে, সে নিজের স্বয়ম্বরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশ্বরূপ নিজেও তো বদলে গেছে, সেদিন নদীর তীরের ভাঙা মন্দিরে শিভমকারীর সঙ্গে তার যা কিছু হয়েছে, এ সবই তার পরিবর্তনকেই ইঙ্গিত করছে। কিন্তু এই দুই নারীর মধ্যে কাউকে নিয়ে সংসার করা তার পক্ষে কি সম্ভব? এত ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সে আবদ্ধ থাকতে চায় না। তবে কী চায় সে? সেই উত্তরও তার কাছে নেই। ট্রেন এগিয়ে চলেছে, বিশ্বরূপ আর রবীন স্যার মুখোমুখি বসে আছেন। একটু আগে ওদের দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। দুজনেই বাইরের চলমান পর্বত, সবুজ উপত্যকা আর গ্রামগঞ্জের বিচিত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করছেন। এমন সময় রবীন স্যার বললেন, "মহাপ্রভুর সাথে বিশ্বরূপের মানে শঙ্করারণ্য পুরীর দুবার দেখা হয়েছিল। প্রথমটা নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের আগে এবং পরবর্তীতে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে।

বিশ্বরূপ যত শোনে ততই যেন অবাক হয়, কত রহস্যময় মানুষ এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কতরকমের তাঁদের রূপ। কোনওটা বাহ্যিক রূপ, যা আমরা দুচোখে দেখি। আরেকটি রূপ, যা আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের বাইরে কয়েক আলোকবর্ষ দূরের আরেক সত্ত্বা, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নদে'র নিমাই, নিতাই এদের সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা অত্যন্ত সাধারণ। কারণ, আমরা মানুষগুলোই অত্যন্ত সাধারণ। তাই সবাইকে নিজেদের গণ্ডীর মাঝে অত্যন্ত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে যাই। আর বিশ্বরূপ, এই মহান মানব সম্পর্কে প্রায় কোনও ধারণাই আমাদের নেই।

রবীন স্যার বললেন, "নীলাচলে কিছুদিন অবস্থান করার পর মহাপ্রভু ১৪৩২ শকে অর্থাৎ ১৫১০ সালের ৭ই বৈশাখ, দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করেন। তাঁর এই যাত্রার পেছনে এক মহান উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন এক অধ্যায়ের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য এই যাত্রা। সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত ছিল। গুপ্তচরের কাছ থেকে তিনি যে নির্দেশ পেয়েছিলেন, সেখানে উল্লেখ ছিল যে এই যাত্রায় তিনি যেন কাউকে সঙ্গে করে না নিয়ে যান। এই বিশাল

নেটওয়ার্কে কে কতদূর কার সাথে যাবে সেটুকু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। খুব কাছের একজন মানুষ, যার সাথে দীর্ঘ পথ তুমি চলেছ, কোন একটি পর্যায়ে গিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হল যে, তোমার খুব কাছের সেই মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর খবর ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হল। হয়তো, এর পেছনেও কোনও মহান উদ্দেশ্য ছিল। কোনও একজন কিংবা কয়েকজন হয়তো জানেন যে, তিনি জীবিত রয়েছেন, কিন্তু তোমাকে সেই সংবাদ দেওয়া হল না। তোমার খুব কাছের কেউ সেই সংবাদ জানলেও তোমাকে তা কোনদিন জানাবে না। নিত্যানন্দের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। নিমাইয়ের সাথে দক্ষিণ ভারতের পথে যারা যাত্রা করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন, নিত্যানন্দ পার্ষদ কৃষ্ণদাস আর গোবিন্দদাসের কড়চা মতে, কৃষ্ণদাস এবং গোবিন্দ দাস দুজনেই মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

"দক্ষিণ যাত্রায় তুমি যাবে অতি দূর।
সঙ্গে থাক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর।।
পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে।
যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে।"

মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য তাঁর দাদা বিশ্বরূপের পথ অনুসরণ করেছিলেন। নিত্যানন্দ কিংবা গৌরাঙ্গ- এদের তৈরি করার দায়িত্ব ছিল বিশ্বরূপ তথা শঙ্করারণ্য পুরীর মতো সন্ন্যাসীদের। সংসারে আবদ্ধ মানুষদের দ্বারা কোনও মহৎ কাজ সম্ভব না, তাই পিছুটানহীন এই সব নিঃস্বার্থ মানুষদের এই কাজে নিয়োগ করা হত।

বিশ্বরূপ বলল, "কে নিয়োগ করতেন? মানে মাস্টার মাইন্ড তো কেউ একজন থাকবে।"

—"এখানে নবদ্বীপধামে মাস্টার মাইন্ডের কাজ করেছিলেন অদ্বৈতাচার্য। এই অদ্বৈতাচার্যের ওপরেও তো কেউ থাকবেন। সেটাই স্বাভাবিক, সেখানে পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা মহতী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশ্বরূপ, অনেকে মনে করেন বিশ্বরূপকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন ঈশ্বরপুরী। আমি বরং শ্রী চৈতন্যের প্রসঙ্গে আসি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন সময়ে গোপনে নবদ্বীপধাম ত্যাগ করেছিলেন। কখনও বলেছিলেন, পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্টের আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন, আবার কখনও বলেছিলেন গয়ায় পিতার পিণ্ডদান করতে যাচ্ছেন। তাঁর জ্যাঠতুতো দাদার লেখা বর্ণনা থেকে জানা যায় তিনি শ্রীহট্টে যাননি। তাহলে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন। এদিকে মহাপ্রভু ছিলেন বহুভাষাবিদ। তিনি নাকি তেরো-চোদ্দটি ভাষা জানতেন। অল্প বয়সে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রাকৃত ও পালিভাষা পড়েছিলেন। কিন্তু বাকি ভাষা

তিনি শিখলেন কোথায়? তামিল, তেলুগু, মালায়ালামের মতো বিভিন্ন ভাষা শিখতে গেলে তো সেইসব ভাষার পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এর অর্থ সন্ন্যাস গ্রহণের বহু আগেই তিনি দক্ষিণ ভারতসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এই ব্যাপারটা অনেকটাই গুপ্তচরদের মতো। গুপ্তচরেদের যেমন বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ হতে হয়, ঠিক সেইভাবে গৌর, নিতাই এঁদেরও প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। আর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে তাঁর পালি এবং প্রাকৃত ভাষার প্রশিক্ষণের পেছনেও বৌদ্ধ ধর্মীয়দের সাথে যাতে তিনি সংযোগ স্থাপন করতে পারেন সেটা একটি কারণ ছিল। এই সব ভাষার ওপর দক্ষতার কারণে তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রেও জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর যাত্রাপথে বহু বৌদ্ধকে তর্ক যুদ্ধে হারিয়ে বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন। মুসলিমদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিনি আরবী, পারসী এই দুটি ভাষা রপ্ত করেছিলেন। সেই সাথে সংস্কৃত, হিন্দী, ওড়িয়া, মৈথিলী সহ আরও বেশ কিছু ভাষা জানতেন।

অগ্রজ বিশ্বরূপের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিনি ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে যাত্রা শুরু করেন। নিত্যানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তদের তিনি আলালনাথে বিদায় জানালেন। মহাপ্রভুর কাছে নির্দেশ ছিল তিনি যেন একা যান। নিত্যানন্দ পর্ষদের দুজন তাঁর সেবার জন্য গিয়েছিলেন বলে কিছু জায়গায় উল্লেখ থাকলেও, আমার মনে হয় তিনি একাই গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কেউ তাঁর সাথে ছিলেন না।"

বিশ্বরূপ বললেন, "তাহলে শ্রীচৈতন্য তাঁর সন্ন্যাস নেওয়ার আগেও বিশ্বরূপের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং এই যোগাযোগ তাহলে অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল?"

—"হুম তা তো ছিলই। এবার বরং আমি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের প্রসঙ্গে আসি। পর্ষদদের আলালনাথে বিদায় জানিয়ে মহাপ্রভু এলেন কুমীনগরে। এখান থেকে জিয়ড় নৃসিংহ গ্রাম প্রায় চল্লিশ ক্রোশের পথ। এককালে এখানে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুরের রাজধানী ছিল বলে শোনা যায়। বর্তমানে এই অঞ্চলকে আমরা সীমাচলম নামে চিনি। চারিদিকে সবুজ ঘন জঙ্গল বেষ্টিত এই পথে হিংস্র জন্তু তথা হিংস্র মানুষের ভয় তো আছেই। কিন্তু কোন কিছুকেই সেই অর্থে তিনি ভয় পেলেন না। কৃষ্ণের নাম নিয়ে এই পথে তিনি চলতে থাকলেন। প্রায় অর্ধেক পথ পার করার পর মাঝ রাতের দিকে রাস্তার ধারে একটি মন্দির দেখতে পেলেন তিনি, পূর্ণিমার রাতে চারিদিক বেশ পরিষ্কার। দূরের পাহাড়ের মাঝে চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমাদের নিমাই দেখতে পেলেন রাস্তার ডান দিকে একটা বিশাল বড় ভীমাকৃতির গাছের নীচে কে যেন হাতে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নিমাইয়ের মনে ভয় ডর

একটু কম, কোনও কিছুকেই তিনি ভয় পান না। তাই এত রাতে জঙ্গলের ধারে মশালের আলো দেখেও তিনি ভয় পাননি। তাঁর ধারণা ছিল, একজন নিঃস্ব সন্ন্যাসীকে কোন দস্যু কিংবা দানব কখনই আক্রমণ করতে পারে না। নিমাই খুব দ্রুত পথ চলছিলেন, কিন্তু এবার তিনি নিজের গতিকে ধীর করে এগিয়ে চললেন। মশালধারীর কাছে পৌঁছে বললেন, "জয় নৃসিংহের জয়, জয় নৃসিংহের জয়।" মশালধারী তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বলল, "নৃসিংহ মহারাজ আপনাকে আজ রাতে এই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেছেন, আমার দায়িত্ব ভোরবেলা আপনাকে নৃসিংহ গ্রামে পৌঁছে দেওয়া।"

মহাপ্রভু জানেন এই নৃসিংহ মহারাজ আসলে কে। তাই তাঁর সাথে দেখা করার জন্যই তো আজ তাঁকে এত দূরে পাড়ি দিতে হয়েছে।

সেই রাতে নিমাই এই গভীর জঙ্গলের মাঝের মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। মন্দিরটা খুব বড় না, ছোট পাথরের তৈরি মন্দির। অন্ধকার গর্ভগৃহের ভেতরে তাঁর জন্য আগে থেকেই খাবার আর রাতের বিশ্রামের সব ব্যবস্থা ছিল।"

বিশ্বরূপ বললেন, "আপনি কী করে জানলেন এসব কথা? এ তো নিমাই ছাড়া আর কারও জানার কথা না।"

রবীন মাস্টার বললেন, "বহু বছর আগে আমি নিমাইয়ের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের ওপর গবেষণা শুরু করেছিলাম। সেই সময় খড়গপুরের শ্রীরামচন্দ্র নামে এক তেলুগু যুবকের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমি আর সে এক সাথে বিশাখাপত্তনমে যাচ্ছিলাম। সেই সময় সেই যুবক আমাকে নৃসিংহপুর গ্রামে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। এই গ্রামটিতে শিক্ষিত বৈষ্ণব পণ্ডিত পরিবারের বসবাস। প্রত্যেক বাড়িতে এখনও বহু প্রাচীন পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এঁদের গ্রামে গিয়ে আমি জানতে পারি যে, শঙ্করারণ্য পুরী নাকি বহুদিন ছদ্মবেশে এই গ্রামে বসবাস করেছেন এবং আমাদের নিমাই নাকি তাঁর সাথে এই গ্রামেই দেখা করতে এসেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ নাকি নিমাইকে এই গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন, আর তা তিনি করেছিলেন শঙ্করারণ্য পুরীরই নির্দেশে। সেই ব্যক্তি তালপাতার মধ্যে এই বর্ণনা লিখে গেছেন। এই গ্রামের মানুষেরা খুব ছোটোখাটো ঘটনাও তালপাতার মধ্যে লিখে রাখতেন। এইসব পুঁথি আমি নিজের চোখেই দেখেছি আর শ্রীরামচন্দ্র আমাকে তার অনুবাদ করে দিয়েছিলেন।

এখন আর কোন প্রশ্ন না করে বরং আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। গোদাবরী নদীতীরে জিয়ড় নৃসিংহ গ্রাম। খুব ভোরের দিকে তিনি দূতের সাথে পৌঁছে গেলেন সেই গ্রামে। নদীর তীরে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা এক গ্রাম, দূর থেকে শাস্ত্র পাঠের ধ্বনি ভেসে আসছে। ভোর থেকে এই গ্রামের প্রতিটি মন্দিরে পূজাপাঠ শুরু হয়ে যায়। মহাপ্রভুকে দূত গ্রামের ভেতরে নিয়ে গেলেন না, গ্রামের প্রবেশ পথের ডান দিকে একটি পথ চলে গেছে নদীর

দিকে। সেই পথ ধরে তাঁরা চলতে লাগলেন, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। সবুজ পাহাড়ের ধার দিয়ে নদী বয়ে গেছে, সেই নদীর ধারে বিশাল আকৃতির সব পাথর। একটি পাথরের ওপর সাদা রঙের পোশাক মেলা আছে। তার থেকে কিছুটা দূরে একটি পাথরের তৈরি একতলা বাড়ি। বাড়িটির রঙও কালো রঙের। দূত বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে মুখ থেকে পাখির ডাকের মতো আওয়াজ বার করল। একদিকে নদীর কলকল ধ্বনি, নানারকম পাখিদের কলরব আবার সেই সাথে গ্রাম থেকে সমস্বরে শাস্ত্র পাঠের ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। এই এত কিছুর মাঝে দূরের পাখির ডাকটা একেবারে অন্যরকম।

পাথরের বাড়ির দরজাটা আওয়াজ করে খুলে গেল, নিমাই দেখতে পেল, কেউ একজন দরজা খুলে ভেতরে চলে গেলেন। দূত তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কাজ এত দূর পর্যন্তই ছিল। এখান থেকে আপনি একা চলে যান।"

নিমাই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন ঘরের এক কোণে প্রদীপ জ্বলছে, সেখানে সাদা পোশাকে এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। মাঝে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেলেও, শরীর-স্বাস্থ্য এবং মুখের গঠন একই রয়ে গিয়েছে। এখানে শঙ্করারণ্য পুরী তাঁর দাদা নন, তাঁর ভূমিকাটা একেবারে অন্যরকম। তাছাড়া সন্ন্যাসীদের আবেগ অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে যাওয়া মানায় না। তিনি নিমাইকে বললেন, "দীর্ঘ পথের পরিশ্রমে এখন তুমি ক্লান্ত। নদীতে স্নান সেরে কিছু খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নাও। তারপর অন্য কথা হবে।

এই গ্রামে নিমাই সাত দিন ছিলেন। এই সাত দিন তার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। শঙ্করারণ্য পুরী এই গ্রামের প্রতিটি মানুষকে পরম বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন এবং এই গ্রামের দুজন রত্নকে বৃন্দাবনে লোকনাথের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হিন্দু রাজাদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং মুসলিম রাজাদের আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য সারাদেশের থেকে যোগ্য যুবকদের বৃন্দাবনে পাঠানো হচ্ছিল। সেখান থেকে প্রত্যেকের কাজকে ভাগ করে দিয়ে, প্রত্যেককে প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা স্থানে পাঠানো হত। এদের মধ্যে কেউ ডাকাত সেজে জঙ্গলে থাকতেন, কেউ আবার ভিক্ষুক সেজে পথের ধারে পড়ে থাকতেন, আবার কেউ পতিতা হয়ে পতিতাপল্লীতে আশ্রয় নিতেন। বহু নারীর আত্মত্যাগের কাহিনীও এই ইতিহাসের সাথে যুক্ত হয়ে আছে।

নৃসিংহ গ্রাম থেকে মহাপ্রভুর পরবর্তী লক্ষ্য ছিল রায় রামানন্দের সাথে দেখা করা। সেখানে শঙ্করারণ্য পুরীর যাওয়া সম্ভব না, তাই নিমাইকে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর কাজ শেষ হলে তিনি যেন কড়পার নিকট সিদ্ধ বটেশ্বর শিবকে দর্শন করতে যান। এখানে তাঁর প্রেরিত দূত নিমাইয়ের সাথে দেখা করতে আসবেন। নিমাই এই কথা শুনে বললেন, "কিন্তু আপনি?

আমি যে আপনার সাথে পরবর্তী দীর্ঘপথ এক সাথে পাড়ি দিতে চাই। উত্তরে শঙ্করারণ্য পুরী বললেন, "তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।"

ট্রেন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। রবীন মাস্টার বলল, "ট্রেন প্রায় ন'ঘণ্টা দেরীতে চলছে। কাল পুণা পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে যাবে।"